কবিতার ভাষ্য
অন্য পাঠ

অর্ণব সাহা

লিটলবার ফিয়েরা

মর্মভেদী বিষ

কবিতা লিখতে লিখতেই কবিতা পড়তে শেখা। এ এক ঘাতক অনুষঙ্গ, যা রক্তে চারিয়ে যায় দ্রুত। আমার শৈশব-কৈশোর যে তল্লাটে কেটেছে, দমদমের সেই আধা-উপনিবেশ, পিনকোড কলকাতা অথচ নাগরিকতার পাশ ঘেঁষে বাড়তে থাকা এক অপসৃয়মান, ক্ষয়িষ্ণু জনপদ। এক পিছিয়ে থাকা, সর্বার্থে হেরে-যাওয়া নস্টালজিয়া, যাকে ঘিরে মাথার ভিতর কুয়াশা ঘনিয়ে ওঠে। বাড়িতে সংস্কৃতির ছিঁটে-ফোটাও ছিল না। ফলত, কবিতার খাতা লুকিয়ে রাখতে হত দীর্ঘদিন যাবৎ, যতোদিন না 'দেশ' পত্রিকায় কবিতা ছাপা হল। সেটা ১৯৯৩, আমি ক্লাস ইলেভেন। তার ঠিক দু'বছর আগে ভেঙে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমার আকৈশোর অভ্যাস ছিল দমদমের পুরোনো, অন্ধকার গলি-ঘুঁজির ভিতর সাইকেল নিয়ে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো। দমদমের ওই পাড়া, সত্তর দশকে নকশালপন্থীদের 'মুক্তাঞ্চল'। পুরোনো, মলিন, রং-চটা এক-একটা আধভাঙা বাড়ির গায়ে লেখা 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', স্টেনসিলে আঁকা কমরেড মাও-সে-তুং-এর অস্পষ্ট মুখ। যা দেখে গায়ে কাঁটা দিত। একটা আস্ত প্রজন্ম নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল আমাদের পাড়ায়। পাড়ার মোড়ে, রঞ্জিতের চায়ের দোকানে সারাদিন বসে থাকত কুটু-কাকা। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট আসার আসার পর জেল থেকে ছাড়া পায়, আরও পরে আত্মহত্যা করে। কুটু-কাকার বাড়িতেই আমি প্রথম দেখি পোকায়-খাওয়া কবেকার 'দেশব্রতী'-র সংখ্যাগুলো। একটা ক্যাপশন আজও মনে গেঁথে আছে— শ্রীকাকুলামের লড়াইয়ে নতুন জোয়ার আসন্ন'। অদ্ভুত রোমাঞ্চ আর প্রতিস্পর্ধায় বুক বেঁধেই দমদমের এক অখ্যাত পল্লি থেকে স্বপ্নদর্শনের টাওয়ার তৈরির অবুঝ চেষ্টা, আজ অব্দিও আমি এই একুশ শতকের উপযোগী মেট্রো-ম্যান হতে শিখলাম না। আমার নিজের কবিতায় তাই আজও কোণঠাসা এক রুখে-দাঁড়ানো পুরুষ, প্রেমহীন, ধ্বস্ত-স্বপ্ন, ফিরে ফিরে আসে। সে-ই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় ভূতগ্রস্তের মতো কিছু অগোছালো পঙ্‌ক্তি।

আর, সেইসব এলোমেলো টুকরো লাইন লিখতে লিখতেই এই বইয়ের পাঠ-প্রতিক্রিয়াগুলো তৈরি হয়ে উঠেছে। দেবদাস আচার্য-র 'মৃৎশকট', মৃদুল দাশগুপ্ত-র 'জলপাইকাঠের এসরাজ', জয় গোস্বামীর 'ভূতুমভগবান', 'ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা?', আর সুবোধ সরকারের 'ঋক্ষ মেষ কথা' কীভাবে যেন পাশাপাশি হাতে চলে এসেছিল। আমার কৈশোরের যাপনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল মৃদুলের

সেই অমোঘ পঙ্‌ক্তি— 'আকাশ কালো ঈগল পাখা এবং নদী তুমুল তিস্তা / পথ টেনেছে ভূচুম্বকে, এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা / হাওয়ায় হাওয়ায়, এসো এসো /পথিক সে কোন্ নিরুদ্দেশের / সাতটি ভাইয়ের বুকের জবা আজ চম্পার মিশল চোখে / চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ, শিমুল আর অশোকের...'। এই কবিতার লাইনগুলো আমি কতোবার কতো সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেছি, ইয়ত্তা নেই। আর সেই ছিলা-টান তীক্ষ্ণতার দাবি থেকেই আমিও লিখতে শুরু করি কবিতা, বিশ্বাস করি কবিতা শেষ বিচারে রাজনৈতিক উচ্চারণ, এমনকী প্রেমের কবিতাও আসলে তীব্র রাজনৈতিক মাত্রাবোধে দীক্ষিত।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কবিতায় আমায় সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে ষাটের 'হাংরি আন্দোলন'। এই গদ্যসংকলনের ছ'টি লেখা ষাটের কবিদের নিয়ে। তার মধ্যে শৈলেশ্বর ঘোষ, ফাল্গুনী রায় সরাসরি হাংরির ফসল। অরুণেশ ঘোষও হাংরির সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন, একটু দূর থেকে। মানিক চক্রবর্তীর মতো অসাধারণ প্রতিভাকে ফিরে পড়ার চেষ্টা করেছি। তিনিই বাংলায় প্রথম সচেতনভাবে 'অ্যান্টি-পোয়েট্রি' লিখতে চেয়েছিলেন। দেবদাস আচার্য একেবারেই ভিন্ন ঘরানার কবি। তাঁর কবিতায় সহজতার গভীরেও এক নিহিত পাতালছায়া কাজ করে যায়। আর, ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা নিয়ে আমার আলোচনাটিই সর্বপ্রথম মিশেল ফুকো-র 'হেট্রোটোপিক স্পেস'-কে কীভাবে বাংলা কবিতায় ধরতে চাওয়া হয়েছে, তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। একইভাবে আলোচিত হয়েছেন সত্তরের চার কবি সুবোধ সরকার, রণজিৎ দাশ, শংকর চক্রবর্তী এবং সুব্রত সরকার। সুব্রতদা বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, যিনি আজও যথার্থভাবে আবিষ্কৃত হননি বলে মনে করি। রয়েছে আরও দুটি গদ্য। একটির বিষয় কবিতার ভাষা কীভাবে ক্ষমতার ভাষাকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যটি কবিতায় যৌনতার ভাষ্যপাঠ। যেহেতু মুক্ত যৌনতা এক সমাজ-নিষিদ্ধ বিষয়, কবিতার ভাষা কীভাবে সেই উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সামাজিক ন্যারেটিভে সাবভার্সন ঘটায়, সেটাই ধরতে চেয়েছি ক্ষুদ্র পরিসরে।

এই বই বেরোনোর ক্ষেত্রে যাঁর উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি, তিনি আমার অগ্রজ কবি ও গদ্যকার সব্যসাচী সেন। তিনিই প্রকাশকের দপ্তরে বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান। অশেষ কৃতজ্ঞতা অরুণাভ বিশ্বাস ও 'লিবার ফিয়েরি' প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে, যাঁদের অতিদ্রুত হস্তক্ষেপে এই বই তৈরি হতে পারল। প্রণাম সেইসব সম্পাদকদের, যাঁরা এই লেখাগুলি বিগত সময়ে তাঁদের কাগজে সযত্নে ছেপেছেন।

ধন্যবাদ সহ,

অর্ণব সাহা

কলকাতা বইমেলা ২০১৯

সূ চি

বিকল্পের বাস্তবতা : ভাস্কর চক্রবর্তী ১১
বর্বরের তীর্থযাত্রা : অরুণেশ ঘোষ ২৩
অচরিতার্থ কালপুরুষ : শৈলেশ্বর ঘোষ ৩৩
'ক্রিয়াপদের কাছে ফিরে আসছি...' : ফাল্গুনী রায় ৪২
নিঃস্বতার মধ্যে সেই কপর্দক পড়ে আছে... : দেবদাস আচার্য ৫৪
না-কবিতার দিকে : মানিক চক্রবর্তী ৬৩
'এক কবির অহং-এর উপনিবেশ' : রণজিৎ দাশের কবিতা ৭৪
নরকের গেটে বসে দান্তের সঙ্গে ফুল বিক্রি : সুবোধ সরকার ৮২
অপার্থিব ফুলগাছ : সুব্রত সরকারের কবিতা ১০৮
অবগাহনের খেলা : শংকর চক্রবর্তী ১১৫
ক্ষমতার ভাষা, কবিতার ভাষা ১২৮
যৌনতার দুই মুখ ১৩৬

বিকল্পের বাস্তবতা: ভাস্কর চক্রবর্তী

ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালের বিছানায় শায়িত ভাস্করের শেষ লেখাটি ছিল 'বাস্তবতার মায়া কথাটি আজ প্রথম থেকেই আমাকে টানছিল। এর ভেতরেই আমাদের ভালোবাসা। অসহায়তা। আনন্দ।' —এই হস্তলিপির তারিখ ১০ জুলাই ২০০৫। প্রথম বাক্যের 'আজ' শব্দটি পরে যুক্ত হয়েছে। ফলত 'টানছিল'—এই চলমান অতীত অনায়াসেই যুক্ত হয়ে যায় এক দু-দিক খোলা বর্তমানের সঙ্গে, যাতে ভাস্করের সারাজীবনের লেখালেখির যে-কোনো বিন্দুকেই স্থাপন করা যায় এই শেষ উচ্চারণের প্রেক্ষিতে। বস্তুত, খুব কম লেখকই পারেন এরকম নিখুঁত এপিটাফ লিখে যেতে। কিন্তু উদ্ধৃত ওই শেষ উক্তিটির পাশাপাশি আমি রাখতে চাই 'শয়নযান' বই থেকে নেওয়া আরও দু-একটি লাইন—

"স্বীকার করা উচিত যে, আমি কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক কবিতা লিখিনি। তবু কেউ যদি হঠাৎ এসে আমার কোনো কোনো কবিতার দিকে আঙুল তুলে বলেন যে, 'ওই তো রাজনীতি, ওই তো রাজনৈতিক কবিতা'—আমি হয়তো তেমন একটা বিস্মিত হব না। আমি রাত্রিবেলার প্রেমিক। আমার অধিকাংশ কবিতাই রাত্রিবেলায় লেখা। রাত্রি তার সুন্দর দুটো ডানা দিয়ে আমার সামান্য কবিতাকে ছুঁয়ে আছে।"

—এই দুই উদ্ধৃতির ভেতর কি কোনও যোগ রয়েছে? প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ? 'বাস্তবতার মায়া' কথাটিকে নিয়েই একটু নাড়াচাড়া করা যাক। 'বাস্তবতার মায়া' কি কোনও ভিন্নতর বাস্তবতা? তা কি মায়াবাস্তব? না কি তা কেবল প্রত্যক্ষ বাস্তবের দিকেই একটু আলাদাভাবে তাকানো? সেই দৃষ্টিক্ষেপের উপাদানগুলি তো নিজেই চিনিয়ে দিচ্ছেন ভাস্কর—ভালোবাসা, অসহায়তা আর আনন্দ। হয়তো উপাদানের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বাড়ানো যায়। কিন্তু তাতে ভাস্করের কবিতার মূল সুরের কোনও অদলবদল ঘটবে না। কবিতা, আমরা জানি, অন্য যে-কোনো সাহিত্যিক মাধ্যমের মতোই

আর-এক ধরনের বাস্তবতার 'রি-প্রেজেন্টেশন', যা মূলত ভাষার মধ্য দিয়েই রূপান্তরিত হয়। চারপাশের চেনা বাস্তব থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন কবি, কিন্তু সেই উপাদানের ঝাড়াইবাছাই, আঁশ ছাড়ানো, পুনর্বিন্যাস এবং গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই তিনি যেমন ওই বাস্তবতার এক পৃথক ন্যারেটিভ তৈরি করেন, তেমনই ওই বাস্তবতাকে তিনি interpret-ও করেন। অর্থাৎ একইসঙ্গে তিনি বাস্তবতার অনুবাদক এবং ব্যাখ্যাকারী। ফলত, দৃশ্যবাস্তব তার কবিতায় যে চেহারা পায়, তা আসলে প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে কবির এক অনিশ্চিত দূরত্বকে চিহ্নিত করে। তিনি ওই বাস্তবতার সঙ্গেই অবস্থান করছেন, আবার করছেন না-ও বটে। 'বাস্তবতার মায়া' গড়ে ওঠে ওই নো-ম্যানস ল্যান্ডের সাপেক্ষে। 'মায়া' শব্দটির ভিতর এক ধরনের মেদুরতা রয়েছে। লেখক এবং কথক—দুজনেই যেন অতীন্দ্রিয় স্তরে আচ্ছন্ন। এই নরখাদক, দেওয়া-নেওয়া নির্ভর, রণ-রক্ত-সফল পৃথিবীটাকেই যেন ওই অনুভূতির তাগিদেই আরও একটু বেশি মায়াবী বলে মনে হয়। বস্তুত, তা যেন পৃথক এক বোধের সাহায্যে আবিষ্ট করে কবির চৈতন্যকে। অর্থাৎ সংযোগস্থাপন এবং দূরত্ব বজায় রাখতে পারাই মূল চাবিকাঠি। 'এসো, সুসংবাদ এসো' বইয়ের 'লেখো' কবিতায় ভাস্কর যেন এই খেলারই এক চমৎকার হদিশ দেন—

ঐসব চমৎকার খেলা
আমি জানি, আমি
একদা খেলেছিলাম
আমার শহরে।
আজো এই তুমুল বৃষ্টির দিনে
হে আমার ঘোড়া
তুমি জানো
কেমন মিলিয়ে যেতে পারি আমি
কেমন আবার
নিমেষে তোমাকে দেখা
দিতে পারি—ফুটপাতে—
চায়ের দোকানে।
ছিল বাহাদুরি। আমি
ছিলাম খেলায়
মগ্ন, ওগো

সহসা শুনেছি আজ
নদীর ওপর থেকে
ঘুমের ওপার থেকে—
'লেখো, লেখো,
ইডিয়ট, লেখো'।

একথা অনস্বীকার্য, এই খেলার ভেতরেই কবির বাহাদুরি। কিন্তু ভাস্করের কবিতায় এই খেলার তাৎপর্য অনেক বেশি গভীর। 'বাস্তবতার মায়া' ভাস্করকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু আচ্ছন্ন করেনি। লেখালেখির প্রথম পর্যায়ে ভাস্কর তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েও পথ খুঁজেছেন বেরিয়ে আসার। ফলত খুব শীঘ্রই তিনি যা গড়ে তুলতে পেরেছেন, তাকে একটু ঘুরিয়ে আমি বলতে পারি—'বিকল্পের বাস্তবতা'। কারণ, মূল বাস্তবের উপাদানগুলি এখানেও হাজির থাকলেও তার বিন্যাস, উপস্থিতি ও অর্থ—তিনটিই আলাদা মাত্রা এনেছে। প্রত্যক্ষ বাস্তবের ভেতর অস্বস্তিবোধ করেন বলেই ভাস্কর তাঁর কবিতায় গড়ে তোলেন এই বিকল্প বাস্তব, যেখানে বাস্তবতার আগ্রাসী দাঁত-নখকে প্রতিহত করেন তিনি। যাপন ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী শূন্যতাটুকু তিনি ভরিয়ে তোলেন বিকল্পের অনুধ্যানে। এটি ভাস্করের সচেতন প্রয়াস। এবং এই প্রচেষ্টার ভেতর দিয়েই ভাস্করের কবিতার কথক একটু একটু করে গড়ে তোলেন লেখকের নিজস্ব অবস্থান বা position। রাজনৈতিক অবস্থান নয়, বরং একে বলতে পারি—অবস্থানের রাজনীতি। ভাস্কর কখনও রাজনৈতিক কবিতা লেখেনি—এ কথাটা ডাহা মিথ্যে। তাঁর প্রতিটি কবিতার ভেতর, শব্দ, উচ্চারণ, উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ভাস্কর আসলে চিহ্নিত করতে চান ওই অবস্থানের রাজনীতিকেই। 'রাজনৈতিক'—এই ক্লিশে শব্দটির বহু ব্যবহৃত অর্থ থেকে নিজেকে সরিয়ে প্রতিটি আন্তরিক উচ্চারণকেই তিনি রাজনৈতিক তাৎপর্যে উত্তীর্ণ করেন। সেখানে একান্ত ব্যক্তিগত মৃত্যুবোধ, হতাশা, ভয় বা প্রতিস্পর্ধা, আত্মকরুণা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ থেকে শুরু করে মায়ের চোখের জল, ছোটোবোনের ঘুমন্ত শরীর, ডলি আর মিনুদের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ছবি—সবকিছুই ওই অবস্থানের রাজনীতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

কীভাবে গড়ে ওঠে ওই বিকল্প বাস্তব? 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'র প্রথম কবিতাতেই 'শেষ রাত্তিরের ঝড়ে' উড়ে গিয়েছিল 'হলদে চাদর'-এর ক্ষণস্থায়ী আবরণ, যা সরে গেলে বাস্তবতার কোনো এক অন্য ভয়াল রূপ চোখে পড়ে, যখন শব্দহীন, 'ভৌতিক জ্যোৎস্নায়' মাঠের ভেতর 'পচে, ফুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে' পড়ে থাকে প্রেমিকের মৃতদেহ। গোটা বই জুড়ে

ছড়ানো রয়েছে অসম্ভব অভিমানী, কাতর কিছু স্বীকারোক্তি—এক ক্ষতবিক্ষত যৌবন, অচরিতার্থ, প্রেম ও বন্ধুত্বের হাড় বের করা কঙ্কাল। স্পষ্টতই, এক আগ্রাসী বাস্তবতার চাপে আক্রান্ত কবির ভঙ্গুর অস্তিত্ব—'আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডন আছে।' 'দরজা, খোলো, মা' কবিতায় টের পাওয়া যায় সেই বিপন্নতা যা আঘাতপ্রাপ্ত, ত্রস্ত—

বছর বছর ধরে মিউজিয়ামের
কাচের বোতলে যেন উবু হয়ে আমি বসে ছিলাম
বছর বছর ধরে ইস্কুলের ছেলেমেয়ে ও তাদের মাস্টারমশাই ও দিদিমণি
ইস্কুলের ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবা মা ও ভাই-বোন—উৎসুকভাবে
তাকিয়ে ছিল আমার দিকে
আজ সেই কাচের বোতল আমি ভেঙে ফেলে বেরিয়ে এসেছি—আমি
আজ
ভয়ংকর শরীরে ভাঙা কাচ চারিদিকে ছুড়ে ফেলে
নিজেরই শরীরে ঢুকে, কুঁজো হয়ে, লুকিয়ে আছি রাত্তিরবেলা
দরজা খোলো মা, আজ সারাদিন যতক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি
একজোড়া গম্ভীর লাল চোখ—সারাক্ষণ আমার পেছন পেছন
আমাকে তাড়া করে ফিরেছে

'আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডন আছে'— মেনে নেওয়া-মানিয়ে নেওয়ার এই আত্মসমর্পণ বা 'বিছানা-বালিশ ভেদ করে ওই জেগে উঠেছে তোমার থলথলে পাজামা'র মতো তীব্র আত্মরতিই সব নয়। ১৯৯৯ সালে অদ্রীশ বিশ্বাসকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে ভাস্কর বলেছিলেন—

"শীতকাল-এ বিচ্ছিন্নতার কথা ছিল। কিন্তু এটাকে শেষ সত্য বলে মনে হয় না। আমার কবিতায় এই বিচ্ছিন্নতার ছাপ রয়ে গেছে, কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতায় থেকে আমি হাত-পা ছুড়েছি, মানুষের কাছাকাছি থাকার জন্য।"

তবে, এই প্রথম কবিতার বইতেই ভাস্কর যখন বলেন 'রাতদুপুরে, মানুষের জানলায় উঁকি মেরে দেখেছি/খোলা শরীরের উপর, খেলা করছে, খোলা শরীর/হলুদ বিছানা ভেসে চলেছে স্বর্গের দিকে'—তখন, প্রতিদিনের নিরাভরণ সংলগ্নতা ও ঘনিষ্ঠ উত্তাপের কিছুটা ভাগ কবি ছড়িয়ে দেন আমাদের চারপাশের অসংখ্য ব্যর্থ, শীতল, অচরিতার্থ ও অসম্পূর্ণ জীবনবোধের বিপরীতে, এক বিকল্প প্রত্যয়ভূমির সন্ধানে, যেখানে সম্পর্ক এবং ভালোবাসায় আস্থা রাখা যায়, সমস্ত পরাজয়ের পরও এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য টানটান হয়ে ওঠে স্নায়ুকোশ। ভাস্করের কবিতায়, এই যুদ্ধ অবশ্য ততটা

প্রত্যক্ষ নয়, যতটা নীরব, অনুচ্চারিত। 'এসো সুসংবাদ এসো' এবং 'রাক্ষ্মস্তায় আবার' বইয়ের পৃষ্ঠার-পর-পৃষ্ঠায় নিরুচ্চার রক্তক্ষরণের অসংখ্য চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাত্যহিক বাস্তবতার সঙ্গে যুঝতে গিয়ে বারংবার বিক্ষত হচ্ছেন কবি, অথচ সেই রক্তপাতের অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে তিনি কেবলই পৌঁছোতে চাইছেন ভালোবাসায়, আন্তরিক সুসংবাদে। পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারেই ভাস্কর বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে 'এই বইয়ে বিশেষভাবে ধরতে চেয়েছিলাম সামান্যকে, সাধারণতাকে। যা বিশেষভাবে দেখছি তাকে গুরুত্ব দিয়ে ধরতে—নগণ্য আর তুচ্ছ ঘটনা সেসব। '৭২ থেকে '৭৭ সালের যে-দমবন্ধ সময়টার মধ্যে পড়েছিলাম আমরা, সেটা থেকে মুক্তি পেতেই আমি এইসব আরও আঁকড়ে ধরি এই সময়ে।' রক্তক্ষরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন যদি হয়—

টেবিলে পয়সা রেখে
দুজন তিনজন বন্ধু উঠে যায়—
    দুজন তিনজন বন্ধু
টেবিলে ঘুমিয়ে পড়ে, হাঁটে।
অনেক দূরের থেকে
আমিও নিঃসঙ্গ হাঁটা শুরু করি—
            রক্ত পড়ে
রক্ত ঝ'রে পড়ে।

ঠিক তার বিপরীতেই ভাস্কর বলেন 'রাত্রিদিন আমি অলৌকিক একটা ট্রফি বয়ে নিয়ে চলেছি তোমার জন্যে।' বলেন 'আমার এ হাত আমি বাড়িয়ে দিয়েছি—/যদি ভালোবাসা থাকে/মানুষের মতো যদি হও/টান দাও/বাজুক সেতার।' 'এসো সুসংবাদ এসো'-র টানা গদ্যে লেখা কবিতাগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে মানবজীবনের প্রতি সেই আসক্তি, যা বাস্তবতার অন্য মাত্রাকে চিনিয়ে দেয়, যার ফলে তিনি দেখতে পান, 'চায়ের দোকানে দেবদূত, কাপ-প্লেট ধুতে ধুতে ঘুমিয়ে পড়ছে বারবার'—'পাখির ডিমের মতো খ্যাতিহীন দূরের ছোট্ট শহর, পাখির ডিমের মতোই পড়ে আছে।' সংঘর্ষপ্রবণ, গতিময় পৃথিবীর রাহুগ্রাস থেকে শান্ত বিছানার নিরাপত্তায় আত্মসমর্পণের ইচ্ছা—এই পরিচিত অনুষঙ্গগুলি আবারও ফিরে এসেছে 'রাস্তায় আবার' বইতেও। এখানেও চেষ্টা প্রতিকল্প বাস্তব রচনার—

স্মৃতি হচ্ছে সাপের কামড় যা দিনে দিনে বিষিয়ে ওঠে
জীবনের যেখানটায় ফাঁকা

সেখানে তুমি যত্নে বেড়ে উঠছ প্রতিদিন।
ওগো পাখির পালক, সাদা-নীল-সবুজ বাতাসে
তুমি কবে উড়ে এসে আবার পড়ে থাকবে আমার বুকের ওপর?

স্বরভঙ্গি, বিষয় আর উপস্থাপনার দিক থেকে 'রাস্তায় আবার' অনেকটাই আলাদা। পরবর্তী 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে' বইতে এসে ভাস্কর ক্রমশ একটা বৃহত্তর উচ্চতা বা দূরত্ব থেকে যেন জগৎ ও জীবনের দিকে তাকালেন। এর আগে বিষয়ের ভেতর তিনি নিজে মিলেমিশে যেতেন যেন, বিষয় থেকে আলাদা করা যেত না তাঁকে। কখনো-কখনো বিষয় থেকে নিজেকে উইথড্র করলেও আবার বিষয়ের আকর্ষণে ধরা দিতেন তিনি, কারণ বিষয় এখানে চিরপরিচিত বস্তুপৃথিবীর অচেনা মুখ। 'আকাশ অংশত'-য় পৌঁছে কবিতা ক্রমশ হয়ে উঠল স্টেটমেন্টধর্মী। এক-একটি উচ্চারণ অনেক বেশি স্পষ্ট। ডিটেলিং-এর ঝোঁক কমে এল এইবার। বদলে শব্দব্যবহার হয়ে উঠল অনেকখানি বস্তুনির্দিষ্ট। আগের মতো রহস্য না রইলেও 'বাস্তবতার মায়া' এখানেও এল। তার যাবতীয় শক্তি এবার নিয়োজিত হল স্বল্প, খণ্ডিত বাক্যাংশের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিকের ধ্বস্ত, আর্ত ছবিটিকে উলটোভাবে আঁকার কাজে। যেমন, 'নাচগানের জন্য' কবিতায়—

মাথার ভেতরে যে নদী আমি তার কথা লিখে রাখতে বাধ্য।
আমি লিখে রাখি
ঘনিয়ে-আসা বিপদ আর তার গন্ধের কথা
লিখে রাখি, কাঠঠোক্‌রা আর ম্লান বেতের চেয়ারের কথা
মোরগঝুঁটির বিকেল আজ হাতছানি দিচ্ছে আমাকে
চলো মেয়েরা, একসঙ্গে যাই—
কুয়াশা নেমেছে, নাচগানের জন্যে এবার আমরা তৈরি হই, এসো।

এর সঙ্গে যুক্ত হল শ্লেষ, ঠাট্টা, বিদ্রুপ। বেশিরভাগ সময় নিজেকে নিয়ে, কখনও আবার তার লক্ষ্য চারপাশের অসংগতি। 'স্বপ্ন দেখার মহড়া'-য় যেমন সংকট বিপন্নতাকে অতিক্রম করার প্রস্তুতি, তেমনি চারপাশের সময়টাকে আরও নিখুঁতভাবে ধরার চেষ্টাও রইল। খণ্ডবাক্য, একটি বাক্যের ভেতর সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আর-একটি বাক্য জুড়ে দেওয়া, পরপর অনেকগুলি বিপরীত অনুষঙ্গকে ব্যবহার করা—এই জটিল পদ্ধতিসমূহ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবতা এখানে প্রিজমের মতো কৌণিক চেহারা নিয়েছে। কিন্তু এর ফলে তার সংবেদশীলতা ও সংশ্লেষক্ষমতা বেড়ে গেছে বহুগুণ—

যেমন আজ রাত্তিরে তুমি বলে উঠলে ওই তো বৃষ্টি এলো

আমরা জানলার কাছে এলাম
কিন্তু এতো পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কারোর পেচ্ছাপের শব্দ;
অথবা সেদিন যেমন, রাত্তিরবেলা আলো জ্বালিয়ে আমি
লিখছিলাম ছোট্টো ঘরে—রাস্তা থেকে কে যেন বলল
এই বাঞ্চোত, ঘুমো

এই তেতো, বক্রোক্তির মেজাজ থেকেও ক্রমশ আবার সরে আসবেন ভাস্কর। 'এখন শতাব্দী শেষে চারিদিকে বিষ, তবু/বেঁচে থাকবার মতো নির্জন সাহস দেখা দিলে/দেখা যায় শান্ত পথ বাড়ি শান্ত সন্ধেবেলা'—'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে' শেষ হয়েছিল এরকম স্থির বিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী উচ্চারণ নিয়ে। 'নীল রঙের গ্রহ' ও 'তুমি আমার ঘুম' পেরিয়ে এই শান্ত, সুস্থ, উপলব্ধির স্তরে ভাস্কর পৌঁছলেন 'কীরকম আছো মানুষেরা' বইতে। প্রতিদিনের তুচ্ছতা-হীনতা তাকে আর ততটা বিচলিত করে না। প্রতিটি আঁচড়েই রক্তপাতের চিহ্ন এখানে প্রকট নয়। একেই বলতে পারি প্রাজ্ঞতা, যা একজন কবি অর্জন করেন সারাজীবনের পথচলায়। বাস্তবতাকে এখানে ধরা হয়েছে তার সব ধরনের বাহুল্য ও অতিরেক বর্জন করে। যেন মগজের ভাঁজে লুকোনো রয়েছে অভিজ্ঞতার সারাৎসার। আর্ত প্রশ্ন নয়, উত্তরের কাছাকাছি পৌঁছোনো। 'আত্মতা' এবং 'অপর'-এর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন একদিন। হয়তো সিনথেসিস খোঁজাই ভুল। তবু নিগূঢ় ডায়ালেকটিকের বাইরে কোনও এক উত্তরণের ভাবনাও হয়তো কাজ করে যায় এই বইয়ের কবিতাগুলোয়। সেই ভাবনাই হয়তো রূপ পায় 'কাটাকুটি' কবিতায় কালো কালির ওপর/লাল কালির মর্মান্তিক কাটাকুটি।/ব্যাপারটি কিছুই নয়।/ব্যাপারটা সত্যি তেমন কিছুই নয়/যদি না মনে পড়ে/কালো একটা ছেলে/রক্তাক্ত/ধানক্ষেতে শেষঘুমে ঘুমিয়ে আছে।' 'দেবতার সঙ্গে' বইয়ের দেবতা আসলে কে—এই প্রশ্নের উত্তরে ভাস্কর একবার বলেছিলেন 'এই দেবতা তথাকথিত নয়। হয়তো সে আমি নিজেই, যে আমার বন্ধুর মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকে। অথবা কোন বন্ধুই।...দুরবস্থার মধ্যেও এই বন্ধু-দেবতার আবির্ভাব আমাকে বাঁচিয়েছিল।' তবুও প্রথম তিনটি বইয়ের কণ্ঠস্বরই যেন খানিকটা ভিন্ন ফর্মে প্রবাহিত হয়েছিল, 'দেবতার সঙ্গে' বইতেও। অতিরিক্ত পাওনা হিসেবে ছিল নিস্তরঙ্গ মিশ্রকলাবৃত্তের আলগা গড়ানো চলন। এখানেও প্রেম, আবেগ ও আর্তির এক শান্ত বিস্ফোরণ ছিল। 'এ এক বিস্ময়কর ভালোবাসা—জিজ্ঞাসার চিহ্নগুলো উধাও হয়েছে!'—'দেবতা' নামক কোনও এক স্থির আশ্বাসভূমির উপর পা রেখেও তিনি অনুভব করেছিলেন—'দুশ্চিন্তা'

এ শতাব্দীর বিদ্যুৎচালিত অভিশাপ।' জীবনের শেষ বই 'জিরাফের ভাষা'-তেও আবার সেই মিশ্রকলাবৃত্তের গড়ানো প্যাটার্ন ফিরিয়ে আনবেন ভাস্কর। কিন্তু এই বইয়ের বিশেষত্বই হল এর নির্মেদ, স্পষ্ট একমুখী উচ্চারণ। এও এক ধরনের স্টেটমেন্টধর্মিতা, তবে 'দেবতার সঙ্গে'-র আবেগবাহুল্য থেকে বহুদূরে সরে এসেছেন ভাস্কর। ঋজু, লক্ষ্যভেদে সফল পাঁচ পঙ্‌ক্তির অতিনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কবিতাগুলিকে করে তুলেছে মন্ত্রের মতো অমোঘ। 'দেবতা' আর 'জিরাফ'-এর সম্পর্ক নিয়ে তর্ক চলতেই পারে, তবু এই কালান্তক সভ্যতা কবির কণ্ঠস্বরকে বুঝতে পারে না, ঠিক যেভাবে মানুষ বোঝে না জিরাফের ভাষা, কবিও শেষ অবধি থেকে যান বহিরাগত। তাঁর আগন্তুক অস্তিত্ব প্রতিহত হয় পৃথিবীর চলমান বাস্তবতার নিরেট দেয়ালে, তখনই তাঁকে খুঁজতে হয় অন্য কোনো পৃথিবী, অন্য কোনো পরিসরের স্বপ্ন। তাই তাঁকে গড়ে তুলতে হয় এক প্রতিস্পর্ধী বাস্তবতা। চেনা বাস্তবের উপাদানগুলোই সেখানে অচেনা রূপ পায়—'বোমা ভেবে যা কিছু ছুঁড়ি না কেন, রংমশাল হয়ে যায় সব'। খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে, ভাস্করের কবিতার ক্রমিক পরিচয়ের ভেতর দিয়ে এই বিকল্প পরিসর নির্মাণের চেষ্টা কীভাবে কাজ করেছে তার একটি রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভাস্করের কবিতার ভেতরেই রয়েছে এমন কিছু নির্দিষ্ট প্রকরণ, যার সাহায্যে গড়ে ওঠে ওই বিকল্পের বিন্যাস। কয়েকটি মায়াবী ইঙ্গিত তিনি রেখে যান আমাদের সামনে আর সেই চকিত ইশারায় মুগ্ধ আমরা টের পাই কখন যেন এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি অচেনা জ্যামিতির সামনে, যার নিয়মগুলো আমাদের খুব চেনা, তবুও অচেনা। এরকম দুটি উপাদানের ওপর আলোকপাত করেই এই লেখা শেষ করব। এদের মধ্যে প্রথমটি, ভাস্করের কবিতার এক বহুব্যবহৃত মোটিফ—রাস্তা, বিশেষত শহরের ছোটো-বড়ো পথের ইশারা। ভাস্কর নিজেই বলেছেন—

সারা কলকাতার গলিগুলো আমাকে টানে।... এই গলি আর রাস্তাগুলোর সঙ্গে আমি একটা আত্মিক টান অনুভব করি। এই সরু গলিগুলো অসীম রহস্যে ভরা।... মনে হয়, কোনও কথা এরা বলতে চায় আমাকে। সমুদ্র যেমন ঢেউয়ের সঙ্গে ঝিনুক উপচে দাঁড়িয়ে থাকে, কলকাতাও সেরকম এই গলিগুলোতে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এইসব গলি আর তার মানুষজনদের কথা লিখে রাখাটাই যেন আমার কাজ মনে হত।

সারা পৃথিবীর অন্যান্য পুরোনো শহরের মতোই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে আজকের কলকাতাও। আধুনিক নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন তৈরি হচ্ছে অসংখ্য দানবীয় স্কাইস্ক্র্যাপার, রাস্তাঘাটগুলো হয়ে উঠেছে

ঝাঁ-চকচকে, পুঁজি অর পণ্যরতির উত্তেজনাময় জীবনবোধ ছড়িয়ে পড়ছে জনজীবনে, ততই একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে এই শহরের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো বৈচিত্র্য, তার দুঃস্থ, আটপৌরে অথচ আনন্দে ভরপুর, স্থানিক পার্থক্যগুলো মুছে দিয়ে একধরনের টোটালাইজড ক্ষমতাতন্ত্রের আওতায় চলে আসছে ব্যক্তিগত জীবনের নিজস্বতা, বোধের বহুবিভক্ত অভিব্যক্তিগুলি। এই ক্ষমতাতন্ত্র সর্বগ্রাসী কতকগুলো নিয়মের আওতায় নিয়ে আসতে চায় শহরের নিক্তি-মাপা জ্যামিতিক নকশাকে, অসংখ্য পৃথক, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সময়বোধ বা ইতিহাসের মাত্রাকে একই ছাঁচে ঢেলে এমন এক সমসত্ত্ব সময়মাত্রায় নিয়ে আসতে চায়, যেখানে সময় হয়ে যায় অদৃশ্য, nowhen যেখানে বিচ্ছিন্ন, বাতিল, তাল মিলিয়ে চলতে না-পারা মানুষজন সর্বময় 'ক্ষমতা'র প্যানঅপটিক্যানের চাপে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। এভাবেই 'শহর' হয়ে ওঠে এক বিমূর্ত ধারণা, যার খাপে খাপে নিজেদের মিলিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই আমরা। এই সর্বজনীনতা এক চরম বিপজ্জনক ফাঁদ যা ব্যক্তিনাগরিকের নিজস্বতা হরণ করে ও তাকে দমন করেই নিজের আধিপত্য বজায় রাখে। পুঁজি এই আধিপত্যের চালিকাশক্তি। কিন্তু নাগরিকতার এই সর্বময় কর্তৃত্বের ভেতরেই, পৃথিবীর সর্বত্র, ব্যক্তিনাগরিকের জীবনযাপনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে নিজস্ব ছন্দে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নাগরিকতার যাঁতাকলকে আপাতদৃষ্টিতে মেনে নিয়েও ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব অভ্যাস-রুচি যোগাযোগপদ্ধতি-বন্ধুত্ব-অভিমান-রাজনৈতিক অভিব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলত মেট্রোপলিসের প্যানঅপটিক্যানের ভেতরেই বেঁচে থাকে, ছড়িয়ে যায় ব্যক্তিনাগরিকের ছোটো ছোটো নিজস্ব 'স্পেস' বা 'পরিসর'। এই 'স্পেস'গুলো আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য, কারণ 'ক্ষমতা'বান কর্তৃত্ব এদের হদিশ পায় না, অতএব পড়তেও পারে না। অথচ এই ব্যক্তিগত নিজস্ব পরিসরগুলির সাপেক্ষেই শহর প্রতিনিয়ত নতুন করে সৃজিত হয়। প্রগতি-উন্নয়ন-নগরায়ণের একবগ্গা ন্যারেটিভের ভেতরেই এভাবেই গড়ে ওঠে অন্য এক নাগরিকতার গল্প। এই গল্পের কোনও 'লেখক' নেই, কারণ সকল আমনাগরিকই কোনো-না-কোনোভাবে এর রচয়িতা। তাদের খণ্ডিত জীবনের ভগ্নাংশের সাপেক্ষেই গড়ে ওঠে এই অন্য 'গল্প'। আধুনিক নাগরিক জীবনের ভেতর ব্যক্তিমানুষের এই নিজস্ব 'স্পেস' তৈরির রাজনীতি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন ফরাসি চিন্তাবিদ মিশেল দ্য শার্ত্যু। শার্ত্যু-র ভাষায় নাগরিক নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিমানুষের নিজস্বতার উদ্‌যাপনের এই দ্বন্দ্বকে বলা যেতে পারে 'a contradiction

between the collective mode of administration and an individual mode of reappropriation'। শার্ত্যু দেখাচ্ছেন কীভাবে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের চাপে আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলা মানুষ নিজস্ব যাপনের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলে, 'disquieting familiarity'। চওড়া হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলা ঊর্ধ্বশ্বাস মোটরগাড়ির তীব্র গতির পাশাপাশি শহরের ভেতরেই রয়ে যায় অসংখ্য পায়ে চলা ছোটো-বড়ো গলি-উপগলি। এই উপগলিগুলোর ভেতর ব্যক্তিমানুষের পায়ে হাঁটার প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে এক নতুন যোগাযোগের মাধ্যম। যা আন্তরিক, মন্থর এবং পারিপার্শ্ব সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। এই Walking rhetorics-এরও একটি নিজস্ব রাজনীতি আছে, যা দ্রুত আরও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার আগ্রাসী চরিত্রে অন্তর্ঘাত ঘটায়। ভাস্করের বহু কবিতায় ব্যক্তি পথচারীর এই বেখাপ্পা, নির্জন হেঁটে যাওয়ার ছবি দেখতে পাই। কিন্তু এই রাস্তা বা রাস্তায় হেঁটে যাবার ভেতর দিয়েই ভাস্কর সঞ্চারিত করে দেন তীব্র এক সংযোগের আকাঙ্ক্ষা অথবা চোখের আড়ালে রয়ে যাওয়া অনাবিষ্কৃত মহাদেশ খুঁজে বের করার অভূতপূর্ব বিস্ময়। 'দেখা হবে' কবিতার বহুল উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি 'এসো, ধরো, টেলিফোন/এসো, ধরো টেলিফোন/হেসে বলো—দেখা হবে/রাস্তায় আবার'—এর সংযোগপ্রবণতার পাশেই রয়েছে, 'জীবনসংগীত' কবিতাটি— 'কীভাবে ঘুরি যে পথে-পথে/কীভাবে মরি যে প্রতিদিন.../ট্রাম থেকে নামি/তমাল ডালের খোঁজে/ক্লান্ত হল চোখ, তবু/আমার মায়ের মৃতদেহ/কোন গাছে/ঝোলানো রয়েছে, আজও আমি/দেখি খুঁজে খুঁজে।' এই বিপন্ন চোখের জলই আবার বদলে যায় রাস্তারই অনুষঙ্গে 'বিছানার বদলে রাস্তা, আর ঘুমের বদলে জেগে ওঠা—/আর দৌড়োনো দৌড়োনো আর দৌড়োনো/শুধু একটা পিস্তলের জন্য।' এভাবেই ভাস্করের কবিতায় 'রাস্তা' হয়ে ওঠে এক পুরোদস্তুর কাউন্টার-ডিসকোর্স—

রাস্তা সেদিকেই যাবে যেদিকে তুমি যেতে চাও
রাস্তার কথাটা আমরা প্রায়
    ভুলতেই বসেছিলাম
সেদিন আপাতশান্ত এক সভা থেকে একটা রাস্তা
    লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল
আমাদের বগলের ভেতর থেকে আর-একটা
দু-একটা রাস্তা আমাদের স্বপ্নের দিকে চলে যাচ্ছে
দু-একটা সটান কবরখানার দিকে
রাস্তা যে কতো রকমের